নিঃসঙ্গ মানুষেরা

হরিশংকর জলদাস

রুশদা প্রকাশ

সূ। চি। প। ত্র

খিদে	৯
প্রতিশোধ	১৭
গোধূলি পেরিয়ে	৩১
মনোজবাবুদের বাড়ি	৪২
গগন সাপুই	৫২
তুমি কে হে বাপু	৬১
উপেক্ষিতা	৭১
ঢেন্ডেরি	৭৯
দায়	৯৪
চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত	১০৫
ঢোলদাস	১১৬
সুবল জেঠা	১২৬
সোনালি আঁধার	১৩৬
একটি মনগড়া কাহিনি	১৪৪
আচমকা একদিন	১৫২
সুবিমলবাবু	১৬০
কালু ডোম	১৭০
রক্তপ	১৭৯
নিঃসঙ্গ মানুষটি	১৮৯
দেউলিয়া	২০০

খিদে

– ওই যে বুড়িটাকে দেখছেন, ওর নাম পসন্নবালা।

– পসন্নবালা!

– ঠিক তা না। ওর নাম আসলে প্রসন্নবালা জলদাসী।

– তো আপনি পসন্নবালা বললেন যে?

– মানুষের মুখে মুখে এরকম হয়ে গেছে। একটা নাম মানুষের মুখে মুখে অদ্ভুত চেহারা নেয়– যুধিষ্ঠির হয়ে যায় জুষ্টি, জোনাব আলী হয়ে যায় জোয়ালী।

– তো!

– সেই বিকৃতির কলে পড়ে একদার প্রসন্নবালা আজ পসন্নবালা।

–ও। তা এই অপরবেলায় এই নির্জন সমুদ্রপাড়ে একা একা কী করছে সে? বয়সও তার কম নয়। দেখে তো মনে হচ্ছে আশি পেরিয়ে গেছে। মাথায় এক বোঝা পাকা চুল। এলোমেলো। উকুনও আছে বলে মনে হচ্ছে। দাঁতটাত আছে কি না কাছে গেলে বোঝা যাবে।

– ওই বুড়ি সম্পর্কে আপনার বেশ তো কৌতূহল দেখছি। আপনি ঠিকই বলেছেন– পসন্নবালার শরীরের জীর্ণদশা। খড়িওঠা চামড়া। দাঁত পড়ে গেছে অনেক আগে। কাছে গেলে দেখবেন– তার দুচোখ ভরা পিচুটি। মেরুদণ্ডটা বেঁকে গেছে। তার পরনে ওই যে কাপড়টা দেখছেন, তা কয়দিন আগে ধুয়েছে কে জানে। রং চটে গিয়ে এমন যে হয়ে গেছে, তা শাড়ি না ধুতি, বোঝার উপায় নেই।

– বয়স?

– আপনি ঠিকই ধরেছেন– বয়স তার কম-বেশি আশি-বিরাশি হবে। বাবার মুখে শুনেছি– একাত্তরের যুদ্ধের সময় পসন্নবালার বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। আর হ্যাঁ, ওই সময় তার উনিশ-কুড়ির একটা ছেলেও ছিল।

– ছিল বলছেন কেন? এখন কি ছেলেটি নেই?

– না। চিন্তাহরি এখন নেই। যুদ্ধের সময় মারা গেছে। চিন্তাহরিকে মেরে ফেলা হয়েছে ডিসেম্বরের সাত তারিখে।

– মেরে ফেলা হয়েছে! কে মারল চিন্তাহরিকে। ও বুঝি প্রসন্নবালার একমাত্র সন্তান ছিল?

– শুধু সন্তান নয়, পসন্নবালার স্বামীও ছিল– জগবন্ধু। স্বামী-স্ত্রী মিলে বড় আহ্লাদ করে চিন্তাহরিকে বিয়েও করিয়েছিল যুদ্ধের আগে আগে।

– কারা মারল চিন্তাহরিকে? জগবন্ধু বেঁচে আছে তো? বউটির কী হলো?

– পসন্নবালা সম্পর্কে জানার দেখি আপনার প্রবল আগ্রহ?

– তা তো বটেই। এই পসন্নবালা, এই নির্জন সমুদ্রকূলের বেড়িবাঁধে উপুড় হয়ে মাটি খোঁড়া, মুক্তিযুদ্ধ, জগবন্ধু, চিন্তাহরির মৃত্যু– এসব মিলেমিশে আমার ভেতরে তোলপাড় হচ্ছে মশাই। শুধু আমি নয়, যেকোনো মানুষ এসব শুনলে অবশ্যই আগ্রহী হয়ে উঠবে। আপনি বলুন না, কী হয়েছিল?

– আপনি বীরাঙ্গনাদের খোঁজে এসেছেন না?

– হ্যাঁ, তা তো ঠিক। বাংলাদেশের নানা গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে আমি বীরাঙ্গনাদের একটা পঞ্জিকা তৈরি করছি। কোন গ্রামে তাঁরা কতজন ছিলেন, লাঞ্ছনার ধরন, সমাজে তাঁদের অবস্থান– এসব নিয়ে আমি আমার মতো করে কাজ শুরু করে দিয়েছি। আমারও বয়স কম হয়নি। জানি না আমি এ কাজ শেষ করে যেতে পারব কি না?

– না পারলেও ক্ষতি নেই। শুরু তো করলেন! আপনার দেখানো পথ ধরে আরেকজন এগিয়ে আসবেন। এই ধরনের কাজগুলো কাউকে না কাউকে শুরু করতে হয়। শুরু করেছেন যখন, শেষও হবে একদিন। এজন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলা দরকার নেই।

– আচ্ছা কথা বলছিলাম পসন্নবালাকে নিয়ে, মাঝখানে হঠাৎ বীরাঙ্গনার কথা পাড়লেন কেন?

– কারণ তো একটা আছেই।

– কী কারণ?

– পসন্নবালা একজন বীরাঙ্গনা। আপনার তালিকায় একজন বীরাঙ্গনা বাড়বে। এই কালীপুর গাঁয়ের পসন্নবালার নামটি আপনার পঞ্জিকায় যুক্ত হবে। গোটা দেশের মানুষ জানতে পারবে পসন্নবালা জলদাসী নামের

একজন জলদাসীর সম্ভ্রমও বিসর্জিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। অনেক কঠিন কঠিন শব্দ বললাম, কিছু মনে করবেন না। মনে অনেক আবেগ জমা হয়ে গিয়েছিল। আপনাকে পেয়ে উগড়ে দিলাম।

– আসলে কী হয়েছিল– খুলে বলবেন?

– আমার বয়স তখন দশ কি বারো। যুদ্ধ, স্বাধীনতা, রাজাকার, পাকসেনা, মুক্তিযোদ্ধা, ধর্ষণ, খুন– এসব বোঝার বয়স হয়নি তখন আমার। শুধু বুঝেছিলাম– দেশে কোনো একটা প্রবল ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে। সেই ঢেউয়ের তোড়ে সবকিছু ভেসে যাচ্ছে, সবকিছু তছনছ হতে শুরু করেছে। বিদ্‌ঘুটে পোশাক পরে দলে দলে সেনারা গ্রামটি ঘিরে অবস্থান নিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের ওই বেড়িবাঁধে ঘাঁটি গেড়েছে। আপনাকে যা বলব, তা সব আমার স্মৃতিতে ধরা নেই। কিন্তু আমার বাপ রামকানাই জলদাস দিনের পর দিন, বছরের পর বছর যুদ্ধের কথাগুলো, যুদ্ধকে ঘিরে এই জেলেপাড়ার মানুষদের জীবনের আখ্যানগুলো বারবার আমাকে বলে গেছে।

– তো!

– সেই জন্য আপনাকে যা বলব, তাতে কোনো মিথ্যে নেই। আমার বাপের চোখে দেখা ঘটনাগুলোই শুধু আমি আমার মুখ দিয়ে বলে যাব।

– আমি এই কালীপুর গাঁয়ে ঘটে যাওয়া সমস্ত যুদ্ধকালীন ঘটনা জানতে চাই।

– গোটা কালীপুরের ঘটনা তো আপনাকে বলতে পারব না। শুনতে চাইলে এই জেলেপাড়ার কাহিনিটুকু অপনাকে বলতে পারি। হ্যাঁ, জেলেপাড়ার সকল কাহিনিও আপনাকে বলা যাবে না। কারণ সময়ের অভাব। আপনি পরিচয়ের প্রথম দিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, ঢাকা থেকে আপনি বীরাঙ্গনা নামের মৃত্যুঞ্জয়দের খোঁজে এসেছেন এবং আজকের রাতের ট্রেনেই আপনি ফিরে যাবেন। সূর্য পশ্চিমে গড়িয়ে গেছে। হাতে তেমন সময় নেই। তাই শুধু পসন্নবালার কথাটুকুই বলি।

– তাই বলুন।

দুই

–জগবন্ধুর বাপ ছিল ম্যারা ধরনের। গায়েগতরে বল ছিল না তেমন। বউ-ই গাঁয়ের পাড়ায় পাড়ায় মাছ বেচে সংসার চালাত। এই ভাঙাচোরা সংসারে জৈবিক কারণে জগবন্ধু এল। জগবন্ধুকে বড় ভালোবাসত তার বাপ। মা-

তো অন্ন জোগাড়ে ব্যস্ত থাকত, বাপই জগবন্ধুকে খাঁওয়ানো-নাওয়ানোর কাজগুলো করত।

– তাদের ঘরে আর কোনো সন্তান আসেনি।

– জেলেদের ঘরে অধিক সন্তানই তো আসার নিয়ম। কিন্তু ঘটনা এটা যে, জগবন্ধুর আর কোনো ভাইবোন হলো না।

– তারপর?

– তারপর জগবন্ধু ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল। অন্যজনের নৌকায় মাছ ধরতে যাওয়া শুরু করল জগবন্ধু। তাদের কোনো নাও-জাল ছিল না। কামলাগিরিই করত জগবন্ধু অন্য বহদ্দারের নৌকায়।

– নৌকা-জালের মালিক হওয়া কঠিন বুঝি?

– নৌকা-জাল করতে তো টাকা লাগে। ওই পরিমাণ টাকা সাধারণ জেলেদের হাতে আসবে কী করে! অধিকাংশই দিনে এনে দিন খাওয়া মানুষ।

– জগবন্ধুর বাপও...।

– ঠিক ধরেছেন, জগবন্ধুর বাপের নুন আনতে পান্তা ফুরানোর সংসার। তো এই রকম একটা কঠিন সংসারে একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলল জগবন্ধুর মা আর বাপে মিলে।

– কী ঘটনা?

– জগবন্ধুর বয়স ষোলো পেরোতে না পেরোতেই বিয়ে করিয়ে দিল।

– কাকে?

– কাকে আবার, জগবন্ধুকে।

– এত কম বয়সে!

– কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার আর বিয়ে করানোর রেওয়াজ যে জেলে সমাজে আছে!

– তারপর!

– পসন্নবালা জগবন্ধুর বউ হয়ে এই কালীপুরে এল। তেরো-চৌদ্দ বছরের চটপটে একটা মেয়ে। ওই বয়সেই মেয়েটি সংসারের হালহকিকত বুঝে গেল।

– বুঝে গেল?

– বুঝবে না, গরিব ঘরের মেয়ে যে! এইসব অভাব-অনটন, এক-দুবেলা উপোস থাকা ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে পসন্নবালা।

প্রতিশোধ

আমার বোনটির নাম ছিল মাধুরী।

মাধুরী নামটি আমাদের সমাজে প্রচলিত নয়। ওই ধরনের নাম হিন্দুসমাজে রাখা হয়। মাধুরী, সুরভি, মৌমিতা, সুরঞ্জনা– এইসব নাম শিক্ষিত হিন্দুসমাজে স্বাভাবিক। কিন্তু জেলেসমাজে ওই নামগুলো খাটে না। এই সমাজে মেয়েদের নাম রাখা হয় রসবালা, উন্মাদিনী, বাদলি, যশোদা, বিন্দুরানি, নিদেনপক্ষে সবিতা, সুনীতি। কিন্তু মাধুরী? নৈব নৈব চ।

আমরা দুই ভাইয়ের পর একটি কন্যা জন্মালে আমার বাবা আনন্দে আত্মহারা হলো। হিন্দুসমাজে ষষ্ঠীর দিনে প্রত্যেক নবজাতকের নাম নির্ধারণ করা হয়। জেলেসমাজে ওরকম কুলীন প্রথা মানা হয় না। মাসখানেকের মধ্যে একটা নাম রাখলেই হলো। কিন্তু বাবার তর সইছিল না। হিন্দুসমাজের প্রথামতো ষষ্ঠীর দিনেই আমার বোনের নাম রাখার ব্যবস্থা করল বাবা। আমার বাবা চট্টগ্রাম স্টীলমিলের সুইপার ছিল। ওই মিলে জাপানি প্রকৌশলীরা কাজ করত। মিলের ভেতরেই তাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। তাদের কোয়ার্টারগুলো ছবির মতন, অসাধারণ রুচিতে ঘেরা। ওই জাপানিদের ঘরদোর, সিঁড়ি-টয়লেট পরিষ্কার করার কাজ করত আমার বাবা। কাজের সুবাদে নানা শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে বাবার পরিচয় ঘটে। ফলে সামান্য লেখাপড়া জানা আমার বাবার মধ্যেও রুচির বেশ একটা পরিবর্তন এসেছিল। ছনের ছাওয়া ছয়-আটটা বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে থাকা বসতবাড়িটার ভেতরে এবং বাইরে রুচির ছোঁয়া দেওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে যেত বাবা। জাপানিদের ফেলে দেওয়া পুরনো ফুলের টবটি এনে উঠানের এককোণে রেখে সেখানে একটি মাধবীলতা গুঁজে দিত। ভাঙা চেয়ারে দু'চারটি পেরেক ঠুকে বারান্দার বেড়ার গায়ে লাগিয়ে রাখত। একদিন দেখলাম কাচভাঙা একটি দেয়ালঘড়ি বেড়ার গায়ে ঝুলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে বাবা। সেই বাপ নিজের মেয়ের নাম রাখার ব্যাপারে একটু বনেদিয়ানা দেখালে আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। কর্মক্ষেত্রে একে তাকে জিজ্ঞেস করে, পঞ্জিকা-রামায়ণ-মহাভারত

ঘেঁটে বাবা তার সদ্যোজাত কন্যার নাম ঠিক করল। পরিবার পরিজনদের বলল, 'মাইয়ার ষষ্ঠী অনুষ্ঠান করব। ওই দিন নাম রাখব মাইয়ার।'

ঠাকুমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তুই কী কস অ বাছা? কীসের ষষ্ঠী? ষষ্ঠী আবার কী?'

বাবা তার মাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'তুমি বুঝবা না মা। ওই দিন বাইচ্চার নাম রাখে হিন্দুরা। আমার মাইয়ার জইন্যও ষষ্ঠী অইবো।'

তার মা আমতা আমতা করে বলে, 'ঠিগ আছে। তুই যা ভালা বুঝস কর।'

আমার বোনের ষষ্ঠী হলো। বামুনঠাকুর এলেন। ওঁ নমঃ নমঃ করে পষ্ট-অস্পষ্ট উচ্চারণে কী সব মন্ত্রোচ্চারণ করে গেলেন। মন্ত্রপাঠ থামিয়ে বামুন বললেন 'অ সোমেশ্বর কি নাম রাখবা তোমার মাইয়ার?'

বাবা বলল, 'মাইয়ার নাম অইব মাধুরী জলদাস।'

আমরা একটু অবাক হলাম। ষষ্ঠীতে যে পড়শিরা এসেছিল তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কাঁইচনির মা বুড়ি বলেই ফেলল, 'সাগরী না, পদ্মাবতী না, সোহাগী না, মাধুরী? মাধুরী আবার কী? এই নামের কোনো মাইনে আছে নি?'

'কাকি, মাইনে আছে। তয়, সেই মাইনে তুমি বুঝবা না।' তারপর বাবা মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'শুনছ, কাঁইচনির মা কাকির মাথায় আরেকটু নাইরকেল তেল ঘষে দাও। কোঁচড় ভইরা মুড়ি-বাতাসা দাও।'

জেলেসমাজে মেয়েদের নামের প্রথমাংশের পরে বালা বা রানি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাবা মাধুরীর পর বালা বা রানি রাখাতেও রাজি হলো না। বলল, 'মাধুরীবালা, মাধুরীরানি এসব কী? আমার মাইয়ার নাম অইবো শুধু মাধুরী জলদাস।'

সেইদিন থেকে আমার বোনের নাম হয়ে গেল– মাধুরী জলদাস।

আগে চাকরি থেকে ফিরে বাবা নানা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। নারকেল গাছের গোড়ার মাটি হালকাভাবে খুঁড়ে সেখানে লবণ দিত, বাড়ির পাশের জংলামতন জায়গাটা পরিষ্কার করত, কখনো বারান্দায় বসে গুন গুন করতে করতে বিহিন্দিজাল বুনত। মাঝে মাঝে আমরা ভাইয়েরা কে কোথায় আছি–তারও খোঁজখবর নিত। কিন্তু এখন চাকরি থেকে ফিরেই মেয়ের পুলুকসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বাবা। উঠানে দাঁড়িয়ে উঁচুগলায় ডাক দেয়, 'কোথায় গেলা তুমি? মাধুরী কই গেল?' যেন মাধুরী হাঁটা শিখে

গোধূলি পেরিয়ে

এই গল্পটা কমলকে নিয়ে। গল্পটা একটু পুরনো। এই যে কমল, যাকে আপনারা গল্পটির প্রধান কুশীলব বলুন বা কেন্দ্র চরিত্র, সেও পুরনো দিনের মানুষ। কমলের বয়স এখন সত্তর পেরোনো। আমার ঊনসত্তর। হঠাৎ নিজেকে এ গল্পে টেনে আনলাম কেন জিজ্ঞেস করছেন?

বলছি। আমি কমলের ক্লাসমেট ছিলাম। সিক্স থেকে টেন। আমার নাম-ধাম-পরিচয়- এগুলোরও তো সুলুকসন্ধান দেওয়া দরকার আপনাদের।

ধেত্তেরি! কী আবোলতাবোল বকতে শুরু করলেন? গল্পের প্রথমেই বললেন, গল্পটা কমলকে নিয়ে। তার কথা না বলে নিজের রামায়ণ-কেত্তন শুরু করলেন। আসল বেত্তান্তটাই বলুন মশাই!

আপনাদের ওই এক ধাত, কাহিনিটাই বলে যেতে হবে, আশপাশটার কথা কিচ্ছুটি বলা যাবে না।

তাই তো মশাই, আপনারা গল্প লিখিয়েরা গল্পের শুরু থেকেই বড় ধানাই পানাই শুরু করেন। কেউ ভাষা নিয়ে কুস্তি লড়তে শুরু করেন, আবার কেউ কাহিনিটাকে এমন একটা ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে ফেলে দেন যে পাঠক খাবি খেতে শুরু করে। তাতে শেষ পর্যন্ত হয় কী জানেন?

জানি না তো! কী হয়? ভাষার কুটিলতা আর বৃত্তান্তের ঘেরাটোপে বিরক্ত হয়ে গল্পটাই আর পড়ে না পাঠক।

নানা, আপনি ওভাবে চটবেন না। প্রথমে বলে নেওয়ার ভালো আমি কোনো গল্পকার নই। কথক মাত্র। আর আমার এ গল্পে কুস্তি নেই, কাহিনিকুহকও নেই। একটা বৃত্তান্ত আছে শুধু। এবং সোজাসাপটা ওটাই বলে যাব আপনাদের। ও হ্যাঁ, একটুখানি আমার কথা বলায়, আপনি চটেছিলন। এখন থেকে সে ব্যাপারে খেয়াল রাখব আমি। তবে কমলের কাহিনির ফাঁকেফুঁকে আমার কথাও একটু-আধটু আসবে। নিজগুণে গোস্তাকি মাফ করবেন তখন।

কমলদের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি একই মফস্সলের একই পাড়ায়। কমলদের পশ্চিম মাথায়, আমাদেরটা পূর্বমাথায়।

মফস্লটির নাম কেশবপুর। একসময় গাঁ-ই ছিল এই কেশবপুর। পাশে হাড়িধোয়া নদী, খোলা মাঠ, মাঠে ফসল, মাথাল মাথায় কৃষকের কোমর ভেঙে মাটি কোপানো, মাঝে মাঝে বেসুরো গলায় 'বন্ধুরে' বলে রাখালি গান– সবকিছুই ছিল কেশবপুরে। তারপর হঠাৎ একদিন শহুরে গরম হাওয়া লাগল কেশবপুরের গায়ে। পাকা রাস্তা হলো গ্রাম চিরে। সেই রাস্তা দিয়ে শহর তার চাকচিক্য আর আবিলতা নিয়ে কেশবপুরে ঢুকে পড়ল। এখন কেশবপুর না-গ্রাম, না -শহর।

একই বছরে আমি আর কমল একই ক্লাসে ভর্তি হই, আশালতা হাই স্কুলে। প্রাইমারিটা কোন স্কুলে পড়েছিল কমল জানি না। তবে যে স্কুলেই পড়ুক, পড়ালেখায় বেশ দড় হয়েই সে হাই স্কুলে এসেছে, অল্পদিনের মধ্যে বোঝা গেল।

নানাজন নানা প্রাইমারি স্কুল থেকে এসে ভর্তি হয়েছিল, ফলে কেউ কাউকে তেমন করে চেনে না। অনেক ছাত্র। চিনপরিচয় হতে হতে বেশ কিছুদিন লেগে গেল।

সামনের বেঞ্চে বসতে নবাগতদের মধ্যে কাড়াকাড়ি-পাড়াপাড়ি হতো। কমল কিন্তু ওসবে থাকত না। আগে এলেও পেছনবেঞ্চিতে গিয়ে বসত। বসে বড় বড় চোখ করে ক্লাসের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত দেখে যেত। কী যে দেখত, সে-ই জানে। আমি ক্লাসে ঢুকতাম হাঁপাতে হাঁপাতে। ঘণ্টি বাজবার দু-চার মিনিট আগে। বাবা দোকানে আসতে প্রতিদিন দেরি করে ফেলত। বাবা এলেই বইয়ের ব্যাগটা নিয়ে দে ছুট। কিছু মনে করবেন না, নিজের কথা যে একটু বলতে হয় এখানে!

আমি দিনমনি শর্মা, বাবা চন্দ্রমনি। ভাইবোনের সংখ্যা কম নয় আমার। টানাটানির সংসার। বাড়িতে বাড়িতে পুজো-আচ্চা করে বাবার কটাকাইবাইনকাস। খাবি খাচ্ছিল বাবা। কে যেন পরামর্শ দিল– দোকান দাও একটা, মুদির দোকান। গঞ্জের দিকে দোকানঘর ভাড়া পেলে ভালো, নইলে এখানেই দাও। তোমার বাড়ির উত্তর সীমানায় তো একটুকরা জায়গা খালি দেখছি। উপদেশটা কাজে লাগিয়েছিল বাবা। এধার-ওধার করে কিছু মূলধন জোগাড় করে বাড়ির পাশেই দোকানটি দিয়েছিল বাবা নাম দিয়েছিল– শর্মা স্টোর। একটা সময়ে দাঁড়িয়ে গেল দোকানটা। কর্মচারীও রাখল একজন, নরহরি। বাবা সকালে উঠে স্নান-টান সেরে মন্দিরে ঢোকে। তারপর লম্বা তন্ত্রমন্ত্র। ওদিকে যে সকাল সকাল দোকান খুলতে

হয়, নরহরি এসে যে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবা দোকানের দিকে আমাকে ঠেলে দিল। সকালে আমাকে দোকানে এসে বসতে হয়। সকালেই কাস্টমারের ভিড়। নরহরি মালপত্র দেয়, আমি টাকা গুনে নেই। বাবা আগে তাড়াতাড়ি এলেও ইদানীং দেরি করে আসে দোকানে। আমার তো আবার প্রাণ যায় যায় অবস্থা তখন। সিরাজ স্যার কড়া ধাঁচের। তিনি ক্লাসে ঢোকার পর কেউ 'মে আই কাম ইন স্যার' বললে মাথা গরম হয়ে যায় তাঁর। ওই ছাত্রের হাতে-পিঠে বেত ফালা ফালা করে তবেই তিনি শান্ত হন।

যাক, সকালে ওই দৌড়ের মধ্যে ক্লাসে ঢুকি আমি। কমলের পাশে গিয়ে বসি। তখন কমলের চোখ দুটি দেখে বেড়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করি 'ওরকম চোখ গোল গোল করে কী দেখ কমল?" কমল সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, 'কিছু না।'

'কিছু তো দেখ! বল কী দেখ অমন করে?'

'ওদের দেখি। সামনের সিট নিয়ে কী রকম কাড়াকাড়ি করে ওরা!

আচ্ছা, সামনের সিটে না বসলে পড়ালেখা হয় না? বলে মুচকি একটু হাসে কমল।

আমি বলি, 'সেটা তো ভেবে দেখিনি কখনো! সামনের দিকে বসলে বোধ হয় ফার্স্ট হওয়া যায়।'

মোহনের হাসিটা কমলের চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

বার্ষিক পরীক্ষায় কমল ফার্স্ট হয়। সকল শিক্ষকের নজর গিয়ে পড়ে কমলের ওপর। কমল নির্বিকার। পরের ক্লাসে শিক্ষকরা তাকে সামনের বেঞ্চে বসতে বললেন। কমল পেছনবেঞ্চিতে বসতে থাকল। টেনেটুনে পাস করা আমাকে তার পাশ ছাড়া করল না কমল।

ক্লাস এইটে যখন, এক ধর্মশিক্ষক জয়েন করলেন আমাদের স্কুলে। প্রথমদিনেই উপস্থিত খাতা থেকে মুখ তুলে কড়া গলায় বললেন, "তোর নাম কমল আলী? এ কেমন নাম! হিন্দু না মুসলমানরে তুই?'

কমল সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল ঠিক, কিন্তু স্যারের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। কোনো শিক্ষক তার সঙ্গে তুইতোকারি করেন না। এই জয়েনুদ্দিন স্যার করলেন। এতে হয়তো কমলের অভিমান হয়েছিল। স্যারের প্রশ্নের উত্তরটা তার জানা ছিল। কিন্তু অভিমানের কারণে উত্তরটা দিল না কমল। চুপ করে থাকল। স্যারও নাছোড়। উত্তর শুনবার জন্য ক্লাসটাকে মাথায় করলেন। কিন্তু কমল যেই কে সেই। বোবা যেন সে! কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করে ক্লাস ছেড়ে গেলেন জয়েনুদ্দিন স্যার। যাওয়ার

মনোজবাবুদের বাড়ি

মিস্টার জিম মারা গেল। শিয়রে বসে মৃদুল কাঁদছে। অঝোর ধারায় নয়, নীরবে। ভেতরে ভেতরে। চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে– ভেতরটায় খুব ভাঙচুর হচ্ছে মৃদুলের। মিস্টার জিম মৃদুলের কেউ নয়, আবার অনেক কিছুও।

মিস্টার জিম মানুষ নয়, ডগ। জার্মান শেফার্ড। তাকে কুকুর বলা যাবে না, কুত্তা তো নয়-ই। জার্মান কুকুরের নাম জিম কেন, রুডলফ নয় কেন, নিদেনপক্ষে হিটলার, তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে রাজি নন মনোজবাবু। শুধু বলেছিলেন, খবরদার মৃদুল, কখনো জিমকে কুকুর বা কুত্তা ডাকবে না। বনেদি ডগ, দামিও। যতই অন্যায় করুক, চোখ রাঙাবে না কখনো।

মৃদুল মনোজবাবুদের বাজারসরকার কাম ক্লিনার কাম গার্ডেনার কাম ডগের লালনপালনকারী কাম ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম দিন চাকরিতে যোগদান করার পর মনোজবাবু কথাগুলো বলেছিলেন। একটু দম নিয়ে আরও বলেছিলেন, অন্য কাজে ঢিলা দাও, মাফ করব। কিন্তু জিমের যত্নে কোনো গাফিলতি বরদাস্ত করব না।

মৃদুলের কিছু বলার থাকলেও বলবার সাহস করেনি সেদিন। বেঁচে থাকার জন্য, বাঁচিয়ে রাখার জন্য চাকরিটা ভীষণ প্রয়োজন তার।

রাউজানের দিকে বাড়ি মৃদুলের। গ্রামের নাম ডাবুয়া বা কাঞ্চনা। ভিটেয় আগে বাড়ি ছিল। শক্তপোক্ত। বেড়ার ঘর, টিনের ছাউনি। বাড়ির পাশে জমিও ছিল, গণ্ডা কয়েক। বউটাকে অসুখে ধরল, হাঁপানি। শীতে-গ্রীষ্মে খুল্লুত খুল্লুত, ওয়াক থু। ঘরে দু-দুটো মেয়ে-পাঁচ, আট। কপালের লিখন বলে মেনে নিয়েছিল মৃদুল। চাষের ধানে দুমাস চলে। অন্য ছমাস রিকশাটানা, বাজারে তরিতরকারি নিয়ে বসা। চলে যাচ্ছিল কোনোরকমে। লাউয়ের ডগার মতো মেয়েগুলো বাড়ছিল। আট বছর পর বড় মেয়ে সুতপা গায়েগতরে যুবতি হয়ে গেল। ঘর আসে, মৃদুল ফেরায়। এক-দুই-তিন-চার।

বউ বলে, আর কত ফেরাবে? মেয়ের বিয়ে দেওয়া দরকার।

মৃদুল বলে, ছোট মেয়ে। কত আর বয়স!

খুক খুক কেশে বউ বলে, সুতপার দিকে চোখ মেলে দেখ।

মৃদুল মেয়ের দিকে চোখ মেলে তাকায়। মনে মনে বলে, সত্যিই তো! সুতপা এত বড় হয়ে গেছে! সিদ্ধান্ত নেয়– ঘর আর ফেরাবে না। ঘর-বর মিলে গেল। পাশের গাঁয়ের সুরঞ্জনবাবুর বড় ছেলে। বর ঘাটার আগায় মুদির দোকান চালায়। সুরঞ্জনবাবুর খাঁই বেশি। জমি বেচে মৃদুল সুরঞ্জনবাবুর খাঁই মেটাল। একদিন সুতপা বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়িতে চলে গেল।

সুরঞ্জনবাবুর খাঁই মেটাতে গিয়ে মৃদুল খাঁই-এ পড়ে গেল। জমি হারিয়ে পড়ল বেকায়দায়। দুবেলার অন্ন জোগাড় করা দায় হয়ে গেল। মেরামতের অভাবে ঘরগুলোরও জীর্ণ দশা।

বাজারে তপনের সঙ্গে দেখা হলো মৃদুলের, এক বিকেলে। তপন শহরে এক ব্যবসায়ীর কার চালায়। বউ-সন্তান নিয়ে থাকেও শহরে। মাঝেসাঝে বুড়ো মা-বাপকে দেখতে আসে গাঁয়ে। সেই সুবাদে মৃদুলের সঙ্গে তপনের দেখা।

কী মৃদুলদা, স্বাস্থ্য এ রকম হয়েছে কেন? তপন জিজ্ঞেস করে।

কই, না তো! তোমার মনে হচ্ছে। অনেক দিন পর দেখা তো! মৃদুল কী যেন লুকাতে চাইছে।

না মৃদুলদা, তুমি ঠিক বলছ না। তোমার শরীর কিন্তু একেবারেই ভেঙে পড়েছে। যতই লুকাও, চোখ তো আমার মিথ্যে বলছে না! নরম গলায় বলে তপন।

মৃদুল কেন জানি চুপ মেরে যায়।

এই সময় তপন আবার বলে, কী রকম স্বাস্থ্য ছিল তোমার! এখন শুকিয়ে কাঠ! তা দাদা, ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলবে?

চোখ দুটো হঠাৎ করে ভিজে উঠল মৃদুলের। বাঁ হাতের তালু দিয়ে চোখ ঢাকল মৃদুল। তপন খপ করে মৃদুলের ডান হাতটা ধরে ফেলল। বাজারের একটেরে টেনে নিয়ে গেল। দরদি গলায় বলল, কী হয়েছে তোমার?

মৃদুল চুরমেরে গলায় বলল, বড় অভাব রে তপন, বড় অভাব! বুক চিড়ে একটা শ্বাস বেরিয়ে এল মৃদুলের।

দুবেলা খাওয়া জোটে না। ছোট মেয়েটা না-খেয়ে না-খেয়ে হাড়গিলা হয়ে গেছে। তোর বউদির কথা নাই-বা বললাম। আবেগে তুমি থেকে তুই-তে নেমে এল মৃদুল।

একটু করে কী যেন ভাবল তপন। চোখ দুটোকে করুণ করে বলল, চাকরি করবে তুমি? শহরে?

চাকরি! তাহলে তো বেঁচে যাই রে ভাই! বউ-মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখার সুযোগটা করে দাও তপন। তোমার কাছে ঋণী থাকব আজীবন। মৃদুলের কথায় কাকুতি ঝরে পড়ল।

আহ মৃদুলদা, তুমি এরকম উতলা হচ্ছ কেন! একজনের অছিলায় আরেকজনের উপকার হয়। তোমার চাকরি তুমি করবে, আমি উপলক্ষমাত্র। মৃদুলের দিকে গভীর চোখে তাকাল তপন। তারপর বলল, তবে চাকরিটা...।

কথা শেষ করতে দিল না মৃদুল। ত্বরিত বলল, তবে কী!

কঠিন। বড় কঠিন চাকরি দাদা। বলল তপন।

ব্যগ্র কণ্ঠে মৃদুল বলল, চাকরি না শুধু, গোলামি করতেও রাজি আমি।

ওই গোলামিই করতে হবে তোমায়। বলে তপন।

পরিবারের ভাতকাপড়ের বিনিময়ে যদি তা-ই করতে হয়, করব। তা কাজটা কী ভাই? জানতে চায় মৃদুল।

তপন মৃদু একটু হাসে। বলে, আমার মুখ থেকে না শুনে, নিজের কানে শোনো।

তা না হয় হলো। কিন্তু কাজটা কোথায়?

বললাম তো একটু আগে! শহরে।

শহরের কোথায়?

আমি যে বাড়ির গাড়ি চালাই, সেই বাড়িতে।

তাহলে তো ভাই ভরসা পাই! তুমি থাকলে আমার তো কোনো অসুবিধা হবে না!

সে ভরসা করো না। তোমার চাকরি তুমি করবে। আমার কোনো দায় নেই।

তপনের কথাটা মৃদুলের কানে রূঢ় ঠেকল। মনটা খচ খচ করে উঠল। গ্রামীণ সরলতায় খচখচানিটা উড়িয়ে দিয়ে মৃদুল বলল, ওরকম করে বলছ

গগন সাপুই

মাথা থেকে ঝাঁকাটা নামাল গগন।

শেষ পৈঠায় রাখল। খপ করে বসে পড়ল। সমস্ত শরীরে জবজবে ঘাম। হাফহাতা লালচে গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে একাকার। কপালে-গলায়-পিঠে-বাহুতে লবণ ঘামের ছোপ। বিড়া করা গামছাটায় একটা ঝটকা মেরে হাত-মুখ-গলা ঘষে ঘষে মুছে নিল গগন। ঘনঘন শ্বাস ফেলল বারকয়েক।

তারপর মুখটা উপর দিকে তুলে হাঁক দিল, 'জননী, মা জননী, আপনার সদাইপাতি বুইঝা লইয়া যান।'

তখনো গগনের গা থেকে ঘাম ঝরা বন্ধ হয়নি। ঘামে শরীরখানা দ্রুত ভিজে উঠতে লাগল। আর গগন সেই আধপুরোনো রঙচটা গামছাটা দিয়ে ঘাম মুছে যেতে লাগল।

বেশ ধকল গেছে আজ তার শরীরের ওপর দিয়ে। ভোরসকালে ঝাঁকাটা নিয়ে বাজারের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। ভাগ্য ভালো, দাঁড়াতে না-দাঁড়াতে বুড়োমতন একজন বলল, 'এই যাবি?'

গগন সম্মতির মাথা নেড়েছিল। এক ঘণ্টা ধরে লোকটা বাজার করল আর ঝাঁকায় পুরাল। ঝাঁকার ওজন ধীরে ধীরে বেড়ে গিয়েছিল। গগনের পা দুটো যখন কাঁপবে কাঁপবে, তখন লোকটি বলল, 'চল।'

দেড় মাইলমতন হাঁটিয়ে চারতলায় তোলাল। গিন্নি ঝাঁকাটা খালি করে দিলে দশ টাকার একটা নোট হাতে গুঁজে দিয়ে বুড়োমতনটি বলল, 'যা।'

গগন হতভম্ব হয়ে বলেছিল, 'এত কম দিলেন! এত পথ, এত ভারী বোঝা!'

বুড়োমতনটি হঠাৎ রেগে গিয়ে বলল, 'যা যা, যা দিছি বউত দিছি। তেরিমেরি কইল্লে ওই দশ টাকাও কাইড়া লমু।'

গগনের আর কিছুই করার ছিল না। খালি ঝাঁকাটা নিয়ে মাথা নিচু করে নিচে নামার সিঁড়ি ধরেছিল।

বড় মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল গগনের! বাজারের দিকে ফিরতে ফিরতে খুব কান্না পাচ্ছিল তার। মানুষ মানুষকে এরকম করে ঠকায়!

হাঁটতে হাঁটতে আবার সেই বাজারের মুখ। তখন ওখানে তার মতো ঝাঁকাওয়ালা অনেকে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। তরুণ, যুবক, মধ্যবয়সী। সবাই সবল সুঠাম।

গগনের স্বাস্থ্যটা ওদের মতো নয়। শীর্ণ ক্ষয়াটে চেহারা তার। বহু আগে চুলে পাক ধরেছে। গুঁজুটে শরীরটা টানতে ইদানীং খুব কষ্ট হয় গগনের। বেঁচে থাকার আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে ঢাকায় এসেছে গগন।

দেশি ভাই একজন পরামর্শ দিয়েছে, 'একটা ঝাঁকা কিন্যা মুটেগিরি শুরু করো গগনদা।'

সেই থেকে রায়ের বাজারে ঢোকার মুখে দাঁড়ানো শুরু করেছে গগন।

বেশ ক'বছর কেটে গেল। গগন এবাড়ি-ওবাড়ি বাজারসদাই পৌঁছে দিয়ে চলেছে। কেউ ঠকায়, কেউ আশাতীতও দেয়। কেউ গালি দেয়, কেউ মধুর দুই-একখানা কথা বলে মনটা ভরিয়ে তোলে।

আজ যেমন বুড়োমতন লোকটা তাকে ঠকাল। ঠকানোতে খুব কষ্ট পেত না গগন, ওরকম অনেকেই তার ক্ষীণ শরীরের দোহাই দিয়ে দরদামের চেয়ে কম দেয়।

বলে, 'এই দিয়েছি, অনেক দিয়েছি। মোট বওয়ার শক্তি আছেনি তোমার গতরে?'

গগন বোঝাতে চায়– আমার শরীর যতই দুর্বল হোক, বাজার তো আপনার বাসায় পৌঁছে দিয়েছি?

ঝাঁঝিয়ে উঠে ওরা বলে,'কথা বাড়াইস না। যা তো অহন।' অধোমুখে স্থান ত্যাগ করে গগন।

আজ দ্বিতীয়বার যে যুবকটি তাকে ভাড়ায় নিল, বেশ ভালো। হাসিখুশি। গগনকে আপনি আপনি করে বলছে। শুনতে গগনের ভালোও লাগছে, আবার লজ্জাও লাগছে। সেই কবে আপনি সম্বোধনটা শুনেছে গগন! গ্রামের বাড়িতে যখন ছিল, তখন কতজনেই-না তাকে আপনি বলত! কেউ কাকা, কেউ মামা, কেউ দাদা, কেউ-বা জেঠা ডাকত! সেসব ডাক আর আপনি সম্বোধন গগনের জীবন থেকে মুছে গেছে। এখানে বেশির

ভাগই তুইতোকারি করে, মাঝে মাঝে তুমি। আজ এই প্রথম একজন যুবক তাকে আপনি বলছে!

একটু শিহরণ বোধ কি করছে সে? তবে কেমন যেন শরম শরম লাগছে– এটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না গগনের।

খুব বেশি বাজারসদাই করে নি যুবকটি। ঘরে বোধ হয় মানুষজন বেশি নেই। তাহলে তো অনেক বাজার হতো! একটু আলু-পটল-টমেটো, এক আঁটি শাক, চাল-ডাল মিলে কয়েক সের, দু-তিন ধরনের মাছ আর একটা মুরগি– এই যা!

যুবকটি বলল, 'চলেন।'

গগন ততক্ষণে যুবকটির সঙ্গে অনেক সহজ হয়ে গেছে। বলল, 'আর কিছু লইবেন না স্যার?'

যুবকটি হেসে বলল, 'না। আর কিছুর দরকার নাই।'

বাড়ির উদ্দেশে হাঁটতে হাঁটতে যুবকটি বলল, 'আর কিছুর দরকার ছিল কি না বুঝতে পারছি না। ও স্লিপ করে দিয়েছিল, ভুলে বাড়িতে ফেলে এসেছি।'

গগনের সাহস তখন অনেক বাড়া। বলল, 'নতুন বিয়া কইরছেন বুঝি স্যার?'

যুবকটি একগাল হেসে মাথা নামাল।

গগন বলল, 'ভুইল্যা যাওনর লাইগ্যা বকাছকা শুইনবেন না তো স্যার?'

যুবকটি বলল, 'আরে না না! আপনি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? নাসিমা ওরকম নয়!'

যুবকটির কথা শুনে মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল গগনের। সেই আনন্দ নিয়ে ঝাঁকা মাথায় এগোচ্ছিল গগন। ঝাঁকায় যেন সের সের সদাইপাতি নয়, যেন পাখির পালক বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে। বেশ টাকা দিয়েছিল যুবকটি। এমন টাকা, আজ আর মোট না বইলেও চলবে।

তার পরও বাজারের মুখে ফিরে এসেছিল গগন। মনের অবস্থা এমন, মোট একটা পেলে বইবে, না পেলে ক্ষতি নেই। বস্তিতে ফিরে যাবে। অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পরও কেউ এল না। ফিরে যাওয়ার জন্য দোনামনা করছে গগন, ওই সময়ে ডাকটা শুনতে পেল যে, 'ওই ভারী, যাবে?'

চট করে ডানে ফিরেছিল গগন, ডাকটা ওইদিক থেকেই এসেছিল। ডাক শুনে ছলিম এগিয়ে গিয়েছিল। তাকে উপেক্ষা করে লোকটি গগনের

দিকে তর্জনীটা বাড়িয়ে ধরেছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমাকে বলছি, ধানমন্ডি যাবে?'

গগন সোৎসাহে বলে উঠেছিল, 'হ, যামু স্যার।'

'তাহলে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসো।' বলে সাহেবটি সামনের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন।

রায়ের বাজারের অলিগলি ঘুরতে হয়েছিল অনেক। এখানে সবজির এলাকা তো ওইদিকে মাছের বাজার, ওই পুবকোনায় মসলার দোকান তো পশ্চিমে মুরগির আড়ত।

সাহেবটি পকেট থেকে ফর্দটি একেকবার বের করেন, বিড়বিড় করে নামগুলো মুখস্থ করতে করতে বলেন, 'চলো, ওইদিকে যেতে হবে, অনেকগুলো তরিতরকারি কেনার আছে।'

আবার ফর্দটি পকেট থেকে বের করে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, মাছের বাজারটা ওইদিকে না?'

গগন মাথা নেড়ে বলে, 'হ, অইদিকে, মাংসর দোকানের পিছনে।'

হঠাৎ হাঁটা থামিয়ে সাহেবটি জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, তোমার নামটা যেন কী? এতক্ষণ সঙ্গে থাকলে তোমার নামটা তো জানা হলো না!'

কাঁচুমাচু হয়ে গগন বলে, 'আমার নাম গগন স্যার।'

সাহেবটি বলেন, 'অ...। আমার নাম জাফর। ওই বাড়ির ম্যানেজার কাম বাজার সরকার।'

গগন একটু থতমত খায়। ভাবে– লোকটা পাগলা কিসিমের নাকি! তার মতো একজন সাধারণ মুটের কাছে নিজের নাম বলার দরকার কী! দকার আছে নাকি! তবে জগতের তো ভিন্ন ভিন্ন ধারা! ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন মন-মেজাজ! কেউ বদরাগী, কেউ শান্ত, কেউ সচেতন, কেউ বেখেয়েলি। কেউ সরল, কেউ কুটিল। এই জাফর সাহেবটিও বোধ হয় সরল ধরনের মানুষ! নইলে মুটের সঙ্গে এত কথা কীসের!

বাজার করতে করতে বেশ ভারীই হয়ে গেল ঝাঁকাটা। নিত্যদিনের অভ্যাস, সয়ে যেতে লাগল গগন।

অনেকক্ষণ পর জাফর সাহেব বললেন, 'এবার চলো গগন। ভারী হয়ে গেল না তো! ঝাঁকা বইতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

অসুবিধাকে মনের কোনায় চেপে রেখে হাসি হাসি মুখ করে গগন বলে, 'না স্যার, অসুবিধা নাই। তয় জায়গাটা স্যার আমি ভালোমতন চিনি না।'

তুমি কে হে বাপু

'তুমি কে হে বাপু, সুখনিদ্রায় বিঘ্ন ঘটাতে এলে?' বেদব্যাস জিজ্ঞেস করলেন।

'অপরাধ মার্জনা করবেন। আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার ভীষণ প্রয়োজন। আবেগ প্রবল বলে সময়জ্ঞান বর্জিত হয়েছি।'

'তা যাক, তোমার পরিচয় জানতে চেয়েছি, বলনি।'

'আজ্ঞে আমার নাম অদ্বৈত, অদ্বৈত মল্লবর্মণ।'

'মল্লবর্মণ! অদ্বৈত বুঝলাম, মল্লবর্মণ বুঝতে পারছি না।' বিস্মিত কণ্ঠ ব্যাসদেবের।

'আজ্ঞে এ আমার বংশধারার পদবি। আমার বংশজ্ঞাপক নাম এটি।'

'বংশজ্ঞাপক নামাংশও আছে নাকি এখন পৃথিবীতে। কই আমার সময়ে তো এসব ছিল না।!'

'আপনার সময়ে একটা যুগ গেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর– এ তিন যুগের সমাজ চেহারা প্রায় এক রকম ছিল।'

'আর এখন?'

'এখন কলি যুগ। মানুষের আসল নামের সঙ্গে পদবি জুড়তে হয়। ওই পদবিতেই যত মান মর্যাদা। এখন পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা তেমন নয়, যত না পদবিতে 'অদ্বৈত, তোমার কথা ভালো করে বুঝতে পারছি না। আমার কালে কারো তো পদবি ছিল না। দ্রোণ, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, গান্ধারী, সত্যবতী কারো নামের শেষে কোনো বংশজ্ঞাপক পদবি তো ছিল না! আর আমিও তো ব্যবহার করিনি। শুধু আমি কেন, ত্রেতা যুগের মহান কবি বাল্মীকি, তিনিও তো রামায়ণে কারো নামের শেষে পদবির উল্লেখ করেননি। মানুষের আসল নামটাই তো তার পরিচয় বহন করত।' এতক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে উঠলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। দম নেয়ার জন্য থামলেন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্যাসদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মুখে কিছু বললেন না। ছোট একটা শ্বাস টেনে ব্যাসদেব আবার বললেন, 'পদবি জুড়ে একজন মানুষের নামকে লম্বা করার কারণ কী?'

'ওই পদবিতেই তার জাতিত্ব মানে তার উচ্চতা ও নীচতার প্রকাশ পায়।'

'দেখ ছোকরা, সেই প্রথম থেকেই হেঁয়ালি করে কথা বলে যাচ্ছ। বয়স হয়ে গেছে আমার। করে গুণে হিসেব রাখিনি। তবে হাজার পাঁচেক বছর তো হবে। সব হেঁয়ালির অর্থ বুঝতে পারি না এখন। একটু ঝেড়ে কাশ তো।' ধীরে ধীরে বললেন ব্যাসদেব।

আপনার সময়েও তো সমাজে চারটা বর্ণ ছিল– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র?

'ছিল তো। আমিই তো গীতায় শ্রীকৃষ্ণের দোহাই দিয়ে চতুর্বর্ণের কথা লিখেছি। এটাও উল্লেখ করেছি যে, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে এই বিভাজন।'

'এখনকার পৃথিবীতে গুণ আর কর্মকে ভিত্তি করে মানুষের বিভাজন হয় না।'

'তাহলে!'

'কোথায় জন্মালাম, সেটাই মুখ্য বিষয়। বিএএম পাস দিয়ে মন্ত্রী ব্যারিস্টার হলেও পরিচয়ের সময় ব্রাহ্মণ সন্তান, শূদ্রসন্তান এসব বলে পরিচয় দেয়া হয়। জন্মস্থানটাই আসল, গুণের মূল্য শূন্য।'

'জন্মস্থান মানে! হস্তিনাপুর, পাঞ্চাল, অবন্তী, গান্ধার, কলিঙ্গ– এরকম স্থানের কথা বলছ তুমি? এসব স্থানে জন্মালে....।'

'না না, মহামহিম। এরকম স্থানগত জন্মের কথা বলছি না আমি। আমি বলতে চাইছি বংশের কথা।' ব্যাসদেবের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন অদ্বৈত।

'বুঝিয়ে বল।'

'আপনার সময়ে তো চন্দ্রবংশ, সূর্যবংশ, যাদব বংশ– এসব ছিল। চতুবর্ণের ব্যাপারটাও ছিল। তবে আজকের ভারতবর্ষের মতো প্রকট ছিল না। এখন মানুষের পরিচয় হয় ব্রাহ্মণ, শূদ্র, এসব দিয়ে। ব্রাহ্মণরা মাথায় তুলে রাখার আর শূদ্ররা পায়ে পিষে মারার/ শূদ্রদের মধ্যে আবার অনেক শ্রেণিবিভাজন করে রেখেছে ব্রাহ্মণরা। উত্তম শূদ্র এবং অধম শূদ্র। আমি অধম শূদ্রের একজন মানুষ।'

'মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। শূদ্রের মধ্যে আবার উত্তম অধম কী? শূদ্র শূদ্রই।' বিচলিত কণ্ঠে বললেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

'শূদ্রদের মধ্যে নমঃ শূদ্র নামে আরেকটা শ্রেণি করা হয়েছে। মেথর, ব্যাধ, ধোপা, নাপিত, চণ্ডাল, জেলে– এরা নমঃ শূদ্রের মানুষ। এদের উল্লেখের আগে নমঃ মানে মাননীয় এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সত্য, প্রকৃতপক্ষে এরা নরাধম।' ম্রিয়মাণ গলায় বলে গেলেন অদ্বৈত। ব্যাসদেবের চোখ এবার কপালে উঠল, 'বলকী ছোক্‌রা? তাহলে তো আমিও নরাধম! জেলে নারীর গর্ভে যে আমার জন্ম!'

অদ্বৈত এবার মিষ্টি একটু হাসলেন। বললেন, 'নানা যুক্তি খাড়া করে আপনাকে তাবড় তাবড় পণ্ডিতরা ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।'

'সে কী রকম?'

মেছোনির পেটে আপনি জন্মালেও বাবা তো আপনার ব্রাহ্মণ, দোর্দণ্ডপ্রতাপী ঋষি পরাশর আপনার বাবা। মা যা-ই হন, পিতৃকুলের বিচারে আপনি নাকি ব্রাহ্মণ।'

'তা কী করে হয়। ভারতবর্ষে পিতার চেয়ে মায়ের মর্যাদা বেশি। মাকেই স্বর্গপ্রাপ্তির আধার হিসেবে বর্ণনা করেছেন শাস্ত্রবেত্তারা। জন্মস্থানকে মাতৃভূমি বলে সম্বোধন করা হয়। মায়ের স্থান পিতার চেয়েও অনেক উঁচুতে।' বলতে বলতে উদাস হয়ে গেলেন ব্যাসদেব। তাঁর মা মৎস্যগন্ধার কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

উপরিচর বসু নামের এক রাজার কামের ফসল তাঁর মা। স্ত্রীকে প্রাসাদে রেখে মৃগয়ায় গেছিলেন তিনি। অরণ্য মধ্যেই কামাসক্ত হন। তিনি সংযমি পুরুষ ছিলেন না। বীর্যস্খলিত হলো তাঁর। তিনি যে বীর্যবান পুরুষ স্ত্রীর কাছে তার তো প্রমাণ দেয়া দরকার। অতঃপর রাজপাখির পায়ে বীর্যধারক পত্র বেঁধে রাজধানীতে পাঠালেন। আরেক পাখির আক্রমণে সেই বীর্য পতিত হলো যমুনা জলে। সেই বীর্য ভক্ষণ করল বিশাল এক মৎস্যা। মাছের পেটেই বড় হতে থাকল শিশু। কালক্রমে জেলের জালে মাছটি ধরা পড়ল। পেট থেকে বের হলো এক কন্যা আর পুত্র। কন্যাটির সারা গায়ে মাছের গন্ধ তাই তার নাম হলো মৎস্যগন্ধা। ধীবররাজের ঘরে বড় হতে লাগল কন্যাটি। কালো কিন্তু অসাধারণ সুন্দরী মৎস্যগন্ধা। বিবাহযোগ্য হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। কিন্তু এই মেয়েকে বিয়ে করবে কে? ওর শরীর থেকে বিদঘুটে গন্ধ বেরোয়। চিন্তিত হলেন দাশরাজা। বাড়ির পাশেই যমুনা নদী, সেখানে লোক পারাপারের ঘাট। কত মুণিঋষির যাতায়াত ওই খেয়াঘাট

দিয়ে। খেয়া পারাপার করানোর জন্য সেই ঘাটেই পাঠালেন তিনি মৎস্যগন্ধাকে। তৃপ্ত হয়ে কোনো ঋষি যদি আশীর্বাদ করেন, কন্যাটির শরীর থেকে মাছের গন্ধ দূর হতেই পারে।

অনেকদিন পর সেই আশীর্বাদের সন্ধ্যাটি এল। সন্ধ্যা হয় হয় এরকম সময়ে পরাশর মুণি এলেন খেয়া পার হতে। ওই সন্ধ্যায় তিনি একাই যাত্রী ছিলেন। কূল থেকে একটু দূরে গেলে মুনির নজর পড়ল মৎস্যগন্ধার ওপর। মৎস্যগন্ধা আপন মনে নৌকা বাইছে আর কামমনে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন পরাশর। শ্মশ্রুধারী শীর্ণদেহী মুনিবরের মনে তীব্রভাবে বিরংসা জাগল এবং যমুনার মধ্যিখানে অনেকটা জোর করে উপগত হলেন তিনি মৎস্যগন্ধার সঙ্গে। ওপারে উঠে যাবার সময় অবশ্য তিনি আশীর্বাদ করে গেলেন আজ হতে তোমার শরীর থেকে মাছের গন্ধ উধাও হয়ে যাবে। পুষ্পগন্ধী হবে তুমি।

অনেকটা আপন মনে আবার বলতে শুরু করলেন ব্যাসদেব, 'ঋষি পরাশর ব্রাহ্মণ, মানি। কিন্তু মা তো আমার জেলেনি। মাছের পেটে জন্মেছেন, জেলের ঘরে লালিত পালিত হয়েছেন। সেই মায়ের গর্ভে জন্মানো আমি কী করে ব্রাহ্মণ হই? মায়ের পরিচয়েই তো আমার পরিচয়। জেলেনির সন্তান বলে পরিচয় দিতে পেরে আমার গর্ভের কি শেষ আছে?'

অদ্বৈত মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'মুনিবর পরাশরের সঙ্গে আপনার আর সাক্ষাৎ হয়নি?'

'হয়েছে।' উদাস গলা ব্যাসদেবের।

'ক্ষণিক রমণেচ্ছায় উত্তেজিত হয়ে একজন কুমারীকে যে তিনি রমণ করলেন, তার জন্য কি তাঁর মধ্যে কোনো বিবেক যন্ত্রণা হয়নি? জিজ্ঞেস করেননি আপনি?' উত্তেজিত গলায় বললেন অদ্বৈত।

অদ্বৈতের কথা যেন তিনি শুনতে পাননি, এমনভাবে বলতে লাগলেন ব্যাসদেব, 'কী নিদারুণ লজ্জা আর কী দুঃসহ কষ্টের দিন যে গেছে মায়ের। দশমাস পিত্রালয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে জীবনযাপন করে গেছেন মা। শুধু দাশরাজা আর তাঁর স্ত্রী জানতেন কন্যার লাঞ্ছনার কথা। শাড়ির আঁচলে উঁচু পেট ঢেকে প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণা পেতে পেতে সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে গেছেন আমার দুঃখিনা মা-টি। একদিন আমাকে প্রসব করলেন তিনি। পরাশর একদিন এসে যজন যাজন অধ্যয়নের দোহাই দিয়ে আমাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেলেন। তাঁর পূর্বকৃত রিরংসা পরায়ণতার কথা কতবার জিজ্ঞেস করার জন্য মনস্থ করেছি, কিন্তু তাঁর সামনে গিয়ে কুঁকড়ে গেছি

উপেক্ষিতা

'আমি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যাচ্ছি সরমা।' বলল বিভীষণ।

'রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যাচ্ছ!'

'হ্যাঁ।'

'কেন! কোন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যাচ্ছ তুমি।' সরমা বলল।

'এত বড় অপমানের পরও এই রাজভবনে থাকতে বলো তুমি আমায়!'

'দাদা রাবণ তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, না হয় তিনি তোমার ভর্ৎসনা করেছেন।'

'এটাকে ভর্ৎসনা বল তুমি! লাথি মারাকে তিরস্কার বল!' জ্বলে-উঠা কণ্ঠ বিভীষণের।

'তোমার দাদা তিনি। এই মুহূর্তে গভীর উচাটন তাঁর। অস্থিরতার মধ্যে কাজটি করে ফেলেছেন।'

'তাই বলে জনসমক্ষে! প্রকাশ্য রাজসভায়! এতজন সভাষদের সামনে!'

'মাথা ঠাণ্ডা কর তুমি, ধৈর্য ধর।' বলে সরমা।

'এরকম মর্মান্তিক অপদস্থতার পরও স্থির থাকতে বলছ তুমি আমায়? আমার কি পৌরষ নেই! আমি কি এই রাজপরিবারের কেউ নাই!'

'হ্যাঁ, তুমিও তো এই স্বর্ণলঙ্কার রাজপুত্র। দাদা কুম্ভকর্ণ বয়সে তোমার বড় বটে, কিন্তু বড়দার কাছে তোমার গুরুত্ব কুম্ভকর্ণের অধিক।'

'সেই গুরুত্বের কী নিদারুণ মর্যাদা পেলাম আজ! হাঃ!' বেদনা ঝলকে উঠল বিভীষণের কণ্ঠে।

'লঙ্কাধিপতির এরকম দুর্ব্যবহারের কথা শুনে আমারও কম খারাপ লেগেছে বল! অপমানে মরে যেতে ইচ্ছে করেছে তখন আমার।' বলল সরমা।

'সেই অপমান, আমাকে রাজসভায় লাঞ্ছিত করবার সেই ঘটনাটি যদি তোমাকে মর্মাহতই করে, তাহলে রাজবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন? কেন তুমিও আমার সঙ্গে এই কলঙ্কপুরী ত্যাগ করছ না?' সরোষে বলল বিভীষণ।

'আমার যে হাত-পা বাঁধা আর্যপুত্র।' স্বামী বিভীষণের উদ্দেশে করুণ কণ্ঠে বলল সরমা।

'দুটো কারণে হাত-পা বাঁধা আমার।' আবার বলল সরমা।

বিভীষণ বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'দুটো কারণে হাত-পা বাঁধা!'

'হ্যাঁ দুটো কারণে এই স্বর্ণলঙ্কা ত্যাগ করে যেতে পারি না আমি। তার প্রথমটি রামপত্নী সীতা, আর দ্বিতীয় কারণ দেশপ্রেম। শেষেরটা তোমার মধ্যে নেই।' বলল সরমা।

'নেই! নেই মানে কী! আমি কি আমার জন্মভূমি লঙ্কাকে ভালোবাসি না?' চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করে বিভীষণ।

সরমা প্রসঙ্গ এড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

একটু থতমত খেল বিভীষণ। আমতা আমতা করে বলল, 'দেখি, কোথায় যাওয়া যায়!'

'ইতস্ততার ভঙ্গি করে সত্যকে ঢাকছ তুমি।' স্পষ্ট গলায় বলল সরমা।

'সত্যকে ঢাকছি!'

'তাই তো। নইলে সত্য বলতে তোমার এত দ্বিধা কেন?'

'রামশিবিরে যোগদান করতে।' এবার ঢাক ঢাক গুড়গুড়ে গেল না বিভীষণ।

নিরাবেগ গলায় সরমা জিজ্ঞেস করল, 'রাম কে?'

'রাম কে মানে! রাম কে তুমি জান না! দাদা রাবণ যে সীতাকে অপহরণ করে এনেছে, সেই সীতার স্বামী রাম!'

'জানি।'

'তাহলে আবার জিজ্ঞেস করছ– রাম কে!'

'রাম শুধু সীতা উদ্ধারকারী নয়, একজন আক্রমণকারীও। তার হাতে যদি লঙ্কার পতন হয়, এই দেশের কী হবে ভেবেছ?'

'রাবণের মৃত্যু হবে।'

'শুধু লঙ্কাধিপতির মৃত্যুটাই দেখলে, লঙ্কার স্বাধীনতাটা দেখলে না! আর্যদের পায়ের নিচে এই অনার্যরাজ্যটি পিষ্ট হতে থাকবে, সেটা ভাবলে না! লঙ্কা যে অযোধ্যার একটা করদরাজ্যে রূপান্তরিত হবে, সেটা বুঝছ না!'

মাথা নিচু করে থাকে বিভীষণ।

সরমা আবার বলে, 'তোমার মধ্যে আর যা-ই থাকুক, দেশপ্রেম নেই। আর দেশশত্রুরাই অরিদলে যোগদান করে।'

'এসব কী বলছ তুমি! তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি তোমার স্বামী!'

'তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক। স্বার্থপর তুমি।'

'আর তুমি এমন কী বিশ্বাসরক্ষক হয়েছ যে, রাবণের পরনারীহরণকে সমর্থন করছ।'

'দাদার এই কুকীর্তিকে কিছুতেই সমর্থন করি না আমি। তাই বলে বিশ্বাসঘাতক হব কেন? শত্রুদলে যোগ দেব কেন? দেশ তো আমার মায়ের সমান। স্বর্গের বাড়া। এই স্বর্গকে পররাজ্যলোভী রামের হাতে তুলে দেব কেন?'

সরমার কথা শুনে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায় বিভীষণ। নিজেকে সংহত করে। বলে, 'আর যে সীতার কথা বললে! দেশপ্রেমের কথা বুঝলাম, কিন্তু সীতার জন্য রাজপ্রাসাদ ছাড়বে না, বুঝলাম না তো!'

'সেটা তোমার না বোঝার মধ্যেই থাকুক। তোমার দৃষ্টিশক্তি যদি তীক্ষ্ণ হতো, তাহলে এই প্রশ্নটি করতে না। যাক সেকথা। তোমাকে একটা অনুরোধ করব, বড় দাদাকে ত্যাগ করে যেয়ো না। তুমি রাজনীতি-অভিজ্ঞ মানুষ। এই সংকটে তোমাকে বড় প্রয়োজন দাদা রাবণের। দাদা বাহুবলী, কিন্তু মেধাহীন। তোমার কৌশলী পরামর্শে দাদা এই যুদ্ধে অবশ্যই জিতে যাবেন।'

'তোমার কথা রাখতে পারব না আমি। আমাকে যেতেই হবে। রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার জন্য জরুরি।'

'কেন যাচ্ছ?'

'রাবণের পদাঘাত করার শোধ নিতে।'

'আমি বিশ্বাস করি না। তুমি শত্রুশিবিরে যোগদান করছ রাবণের মৃত্যু ঘটিয়ে এই স্বর্ণালঙ্কার রাজা হতে। ধিক তোমাকে।'

'তুমি যতই আমাকে ধিক্কার দাও, তোমায় ভালোবাসি আমি সরমা। আজীবন ভালোবেসে যাব তোমায়।' বলল বিভীষণ।

চোখে তীব্র জ্বালা ছড়িয়ে সরমা বলল, 'বিশ্বাসঘাতকের আবার ভালোবাসা!'

সেদিন স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করেনি বিভীষণ। গোপনপথে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

রাম-লক্ষ্মণ তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

অপার বিস্ময় আর বিপুল অস্থিরতা নিয়ে সরমা রাজপ্রাসাদে ছটফট করছিল। তার একদিকে স্বামীপ্রেম, অন্যদিকে দেশপ্রেম। স্বামীপ্রেমকে হেলায় ঠেলে দেশপ্রেমকে বুকের নিচে জাগিয়ে রেখেছিল।

বিশ্রবা আর নিকষা স্বামী-স্ত্রী। কালে কালে এদের সন্তান হলো– তিনপুত্র, এক কন্যা। পুত্রদের নাম– রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ। আর শূর্পনাখা হলো কন্যার নাম।

কালক্রমে রাবণ লঙ্কার রাজা হলো। মাটির লঙ্কাকে স্বর্ণলঙ্কায় রূপান্তরিত করল রাবণ। রাজপ্রাসাদকে স্বর্ণ দিয়ে মোড়াল। রাবণ শক্তিতে মত্ত।

কুম্ভকর্ণ রাজনীতির কূটচালে থাকে না। রাবণ তার কাছে দেবতার মতন।

বিভীষণ বিচক্ষণ। বুদ্ধিতে ক্ষুরধার সে। ছোটবেলা থেকেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। রাবণ-কুম্ভকর্ণ আজকে দেখে, বিভীষণ দেখে আগামীকালকে বা তারও পরের পরের ভবিষ্যৎকে।

বিয়ের বয়স হলে মা নিকষা বিভীষণের বিয়ের উদ্যোগ নেয়। তার আগে বড় এবং মেজ পুত্রের বিয়ে সম্পন্ন করেছে নিকষা। মন্দোদরীকে নিজে নির্বাচন করেছে রাবণ, নিকষার নির্বাচনে কুম্ভকর্ণের বিয়ে হয়েছে।

বিয়ের প্রসঙ্গে বিভীষণ মাকে শুধু বলেছে, 'মা, তোমার পুত্রবধূকে সুন্দরী এবং নরম স্বভাবের হতে হবে।'

সরমার সঙ্গে বিয়ে হলো বিভীষণের। সরমা শান্ত, নম্রস্বভাবা, সুন্দরী এবং স্নিগ্ধা।

গন্ধর্বকন্যা সরমা। বাবা ব্রাহ্মণ, মা অনার্য্য। গান্ধার দেশে রাজ্য শৈলূষের প্রাসাদে বড় হতে থাকে সরমা। ফুল্ল-কুসুম যেন সরমা! মায়াময় চোখ, লাবণ্যে ভরা দেহ। মনটা দয়ার্দ্র।

মায়ের আদেশে রাবণ বিভীষণের জন্য পাত্রীর সন্ধানে বেরিয়েছে। এদেশ-ওদেশ ঘুরতে ঘুরতে একদিন গান্ধার দেশে উপস্থিত হলো রাবণ। সরমাকে দেখে রাবণ বড় মুগ্ধ হলো। এরকম শাস্ত্রজ, ধর্মমনস্ক, মানবিক কন্যাই তো দরকার বিভীষণের জন্য! বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন গান্ধাররাজ শৈলূষ। মহাসমারোপে বিভীষণ আর সরমাতে বিয়েটা হয়ে গেল।

দিন চলল আপন ছন্দে। বিভীষণে এবং সরমাতে ভালোবাসাবাসির অন্ত নেই। সরমা একমুহূর্তে চোখের আড়াল হলে বিভীষণের উচাটন। বছরাধিককাল অতিবাহিত হলো। সন্তান এল তাদের ঘরে। প্রথমে

তরণীসেন, পরে কলা। তরণীসেন পুত্র, কলা কন্যা। সরমা-বিভীষণের জীবনে সুখ উছলে উঠল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসাবাসি আরও গভীর হলো।

তারপর হঠাৎ সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটল।

রাবণ দোর্দণ্ডপ্রতাপী। তার অনেক গুণ। প্রজাহিতৈষী, দেশপ্রেমিক, বীর, দানশীল, সৌন্দর্যানুরাগী। প্রত্যেক গুণশালী মানুষের চরিত্রে একটা হীনতা থাকে। রাবণের চরিত্রেও সেই হীনতা আছে। রাবণ নারীলোলুপ।

শূর্পনখা পুরুষলোভী। পঞ্চবটী বনে রামকে দেখে সঙ্গসুখের লোভ জাগাল শূর্পনখার মনে। রাম দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা এবং লক্ষ্মণ দ্বারা লাঞ্ছিতা শূর্পনখা রাবণকে সীতার সন্ধান দিল। সীতা অপার রূপসী। এরকম রূপে লাবণ্যে ভরা নারী রাবণপ্রাসাদে নেই। রাবণ বোনের অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সঙ্গে যুক্ত হলো রমণেচ্ছা। পরনারী রমণেতে যে স্বর্গসুখ!

রামের পিতা দশরথের রাজ্য লঙ্কা থেকে বহু বহু যোজন দূরে, অযোধ্যা ছেড়ে রাম-লক্ষ্মসীতার গহিন অরণ্য পঞ্চবটীতে আসার কথা নয়। এসেছিলেন চৌদ্দ বছরের বনবাসে, পিতৃসত্য রক্ষা করবার জন্য। রাম-সীতার পর্ণকুটিরে বসবাস, লক্ষ্মণ ওঁদের নিরাপত্তা-প্রহরী। ইতোমধ্যে তের বছর নয় মাস অতিবাহিত। চৌদ্দ বছর পূর্ণ হওয়ার মাত্র তিনমাস আগে রাবণ সীতাকে হরণ করে বসল।

অপহরণের প্রথম রাত রাবণ সীতাকে রাজপ্রাসাদে রাখল। অন্যরা তো দূরের কথা, সেই রাতে স্ত্রী মন্দোদরীর কাছ থেকেও প্রাসাদে অবস্থান করার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল রাবণ। পরদিন সীতা নিক্ষিপ্ত হলেন প্রসাদ-সংলগ্ন অশোকবনে। ভয়ঙ্কর দর্শন চেড়িরা সীতার প্রহরায় থাকল। চেড়িরা দুরাচারী, তাদের মুখে সর্বদা কটুভাষ। অন্যকারো প্রবেশাধিকার নেই সেই অশোকবনে। অনেক অনুনয়ের পর রাবণের কাছ থেকে সীতাসঙ্গের অধিকার পেয়েছে সরমা। সরমা বড় বোনের মতো সীতাকে সঙ্গ দেয়, অভয় দেয়। সরমার কাছ থেকে রাম-রাবণের সম্ভাব্য যুদ্ধের কথা অবগত হন সীতা।

সীতাহরণের পর লঙ্কার রাজপ্রাসাদ দ্বিধা বিভক্ত। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, অমাত্যসকল, বীরযোদ্ধারা, বীরবাহু, মেঘনাদ, শূর্পনখা সীতাহরণের পক্ষে। তারা সাধারণ জনমানুষকে বোঝাল– রাম পররাজ্যলোভী। আর্যশাসন অনার্যশাসিত লঙ্কা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে বানরসেনা নিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করার

প্রস্তুতি নিচ্ছে রাম। সীতাহরণের ব্যাপারটি কৃত্রিম একটা উপলক্ষমাত্র। কিষ্কিবানররাজ সুগ্রীম বিশ্বাসঘাতক। নিজে অনার্য হয়েও সাদা চামড়ার আর্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

রাজা এবং রাজন্যদর ভাষণে লঙ্কার সাধারণ মানুষেরা রাবণের পক্ষ নিল।

কিন্তু সীতাহরণের বিপক্ষে তিনজন– মন্দোদরী, সরমা এবং বিভীষণ। প্রধান মহিষী মন্দোদরীর কেন জানি মনে হচ্ছে– সীতাহরণ তার জীবনে শনি ডেকে এনেছে। সীতাহরণের পর থেকে রাজা রাবণ কেন জানি তার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে উঠেছে।

বিভীষণেরও মনে হচ্ছে, দাদার এই ভুলটির জন্য স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হয়ে যাবে। লঙ্কার সকল সুখ-স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য তিরোহিত হবে। তাছাড়া একজনের স্ত্রীকে তার অসম্মতিতে গায়ের জোরে উঠিয়ে নিয়ে আসা! এ কেমন কথা! রাজা হয়ে রাবণের এ কী সিদ্ধান্ত! না না, এ বড় অন্যায়, এ বড় অবাচীর্নতা। দাদার এই হঠকারী কাজের প্রতিবাদ জানানো দরকার।

বিভীষণপত্নী সরমারও মনে হয়েছে– লঙ্কাধিপতি মস্তবড় অনীতি করেছেন, সীতাকে পঞ্চবটীবন থেকে হরণ করে এনে। সরমার প্রতিবাদ ওই ভাবনা পর্যন্ত। রাবণের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সাহস নেই সরমার।

কিন্তু বিভীষণ সাহস করে দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'সীতাকে হরণ করে আনা আপনার একেবারেই উচিত হয়নি দাদা। সীতা অন্য একজনের স্ত্রী। পরস্ত্রীহরণে মহাপাপ। শুধু মহাপাপ নয়, জগৎজুড়ে মহাকলঙ্কও রটে যাবে।'

রাবণ ক্রোধান্বিত হলো। প্রচণ্ড পদাঘাতে চিত করে ফেলে দিল বিভীষণকে। রাজসভাতেই ঘটল ঘটনাটা।

অনন্ত অপমানে ডুবে গেল বিভীষণ। অপমান থেকে ক্রোধ জাগল। ক্রোধান্বিত বিভীষণ সিদ্ধান্ত নিল– রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যাবে, রামের দলে যোগদান করবে, রাবণ-ধ্বংসের সকলরকম মন্ত্রণা দেবে রামপক্ষকে।

যাওয়ার আগে সরমার সঙ্গে দেখা করা জরুরি।

দেখা হলো দুজনের। কথাও হলো। দুজনেই সীতাহরণের বিপক্ষে। তারপরও বিভীষণের রামশিবিরে যোগদান করা চরম বিশ্বাসঘাতকতা। সেই কথাই স্বামীকে বলল সরমা।

বলল, 'আমি দাদার এই দুষ্কর্মের বিরোধী। সীতাকে আমি ভালোবাসি। সীতা এই কারাগার থেকে মুক্তি পাক, তাও চাই। কিন্তু এটা কিছুতেই চাই না, এই মুক্তি হবে লঙ্কার স্বাধীনতার বিনিময়ে! তুমি ভাবলে কী করে, রামদলে যোগ দেবে তুমি! কী স্বার্থ তোমার! ধর্মবোধ! আমি নিশ্চিত, ধর্মবোধের তাড়নায় তুমি দাদা রাবণকে ত্যাগ করে যাচ্ছ না। তোমার এ যাত্রায় অন্য কোনো অভিসন্ধি আছে।' অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে উঠল সরমা।

বিভীষণ ত্বরিত বলে উঠল, 'অভিসন্ধি।' বলবার সময় বিভীষণের গলাটা কেন যেন একটু কেঁপে উঠল!

টের পেল সরমা। বলল, 'তোমার লক্ষ্য অন্যকিছু।'

'অন্যকিছু' ধরাপড়া কণ্ঠ বিভীষণের।

'তা-ই মনে হচ্ছে আমার।' একটু থামল সরমা। খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিল।

আবার বলল, 'তোমার লক্ষ্য লঙ্কার রাজসিংহাসন, তোমার লক্ষ্য...। কথা শেষ না করে থেমে গেল সরমা।

বিভীষণ বলে উঠল, 'থামলে কেন, বল বল, আর কী বলতে চাইছ!'

'না থাক। ভবিষ্যৎ' বলবে, তোমার দ্বিতীয় লক্ষ্য কী।' ম্লান কণ্ঠে সরমা বলল।

'ভবিষ্যতের কথা বলছ কেন? এখনই বলো– আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটা কী?' উষ্ণ গলায় বলল বিভীষণ।

সরমা নিষ্ঠুর নির্মোহ কণ্ঠে বলল, 'প্রধান মহিষী মন্দোদরীকে শয্যাসঙ্গিনী করা।'

একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেল বিভীষণ। অনেক চেষ্টাতেও তার মুখ থেকে রা বেরোল না। অনেকক্ষণ পর নিজেকে সংযত করে বিভীষণ বলল, 'এ তোমার উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনা সরমা। বউদি মায়ের সমান। মন্দোদরী আমার সম্মানীয়। রাজমহিষী তিনি। তিনি রূপময়ী, কিন্তু দুর্মূল্য।'

বাঁকা একটু হাসি সরমার ঠোঁটে ঝিলিক দিয়ে উঠল। নীরব রইল সে। যা বলার তা আগেই বলে ফেলেছে সরমা।

নিরুপায় বিভীষণ বলল, 'আমি তোমায় ভালোবাসি সরমা।'

সরমা বলে উঠেছিল, 'বিশ্বাসঘাতকের আবার ভালোবাসা।'

সীতার কাছে ফিরে গিয়েছিল সরমা।

আর বিভীষণ গিয়েছিল রামশিবিরে।

সরমা সীতাকে বলেছিল, 'তোমার মুক্তির দিন আসন্ন সীতা।'

করুণ মুখে সীতা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী করে বুঝলে?'

সরমা বলল, 'শতসহস্র বছর যুদ্ধ করেও রাম তোমাকে উদ্ধার করতে পারত না।'

'এখন পারবে কী করে?'

'রাজা রাবণের ভাই বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ রামদলে যোগদান করেছে।'

'তো–!' অবাক সীতা।

সরমা বলল, 'রাবণনিধনের অন্ধিসন্ধি বিভীষণের ভালো করেই জানা।'

সীতা নিশ্চুপ থাকে।

সরমা গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে।

রাম আর রাবণে ঘোর যুদ্ধ হয়।

রামের পক্ষে বানরবাহিনী, রাবণের পক্ষে রাক্ষসসৈন্য।

রাবণের একলক্ষ পুত্র আর সোয়ালক্ষ নাতি নিহত হলো এই যুদ্ধে। রাবণপুত্র মেঘনাদকে বিভীষণের প্ররোচনায় হত্যা করা হলো। যুদ্ধে নিহত হলো সরমাপুত্র তর্‌ণীসেন। এমন শক্তিমান যে কুম্ভকর্ণ, একদিন সেও হত হলো। শেষ পর্যন্ত লঙ্কাধিপতি রাবণ পরাজিত ও নিহত হলো।

সীতা উদ্ধার হলো।

হাজার লক্ষ আত্মীয়, শত সহস্র স্বজাতিসৈন্যের রক্ত মাড়িয়ে বিভীষণ লঙ্কায় প্রবেশ করল।

রাম বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্তি করলেন।

রাবণপত্নী মন্দোদরীকে বিয়ে করে প্রধান মহিষী বানাল বিভীষণ।

উপেক্ষিতা সরমা বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেল। বিভীষণের জৌলুসময় জীবন থেকে অনেক দূরে সরে গেল সে।

সীতা-পরিত্যক্ত সেই অশোকবনে আশ্রয় নিয়েছে সরমা। জীর্ণ দেহ, শীর্ণ মুখ এখন তার।

মাঝে মাঝে সরমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, 'বিশ্বাসহন্তা!'

বিভীষণের প্রতি সরমার এই কথা কেন?

লঙ্কার স্বাধীনতাহরণে রামকে সহায়তা করেছে বলে? না সরমার প্রতি অবহেলা দেখিয়ে মন্দোদরীকে বিয়ে করেছে বলে?